

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

বাংলা ভাষা:

পৃথিবীতে বর্তমানে জীবিত ভাষার সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের বেশি। তার মধ্যে বাংলা ভাষাও একটি। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ। বর্তমানে পৃথিবীতে চব্বিশ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিম বঙ্গ এবং বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও আসামের কয়েকটি প্রদেশের মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে।

- ⇒ বর্তমানে পৃথিবীতে বাংলা ভাষায় কথা বলে → প্রায় চব্বিশ কোটি লোক।
- ⇒ ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা → পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা।
- ⇒ বাংলাদেশ ছাড়াও বাংলায় কথা বলে → পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের জনসাধারণ।
- ⇒ ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে → দেশ কাল ও পরিবেশভেদে।
- ⇒ বর্তমানে পৃথিবীতে ভাষা প্রচলিত আছে → সাড়ে তিন হাজারের

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে

যথা:

- (ক) প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ)
- (খ) মধ্যযুগ (১২০১ - ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) (অন্ধকার যুগ: ১২০১-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ)
- (গ) আধুনিক যুগ (১৮০১ - বর্তমান পর্যন্ত)

- ⇒ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ (৬৫০- ১২০০ খ্রিস্টাব্দ)
- ⇒ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ (৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ)
- ⇒ এছাড়া বিভিন্ন পন্ডিতের মতে অন্ধকার যুগ বলে একটি যুগকে চিহ্নিত করেছেন, যার সময় সীমা ১৫০ বছর (১২০১-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ)।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব সপ্তম শতকে কিন্তু

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব দশম শতকে।

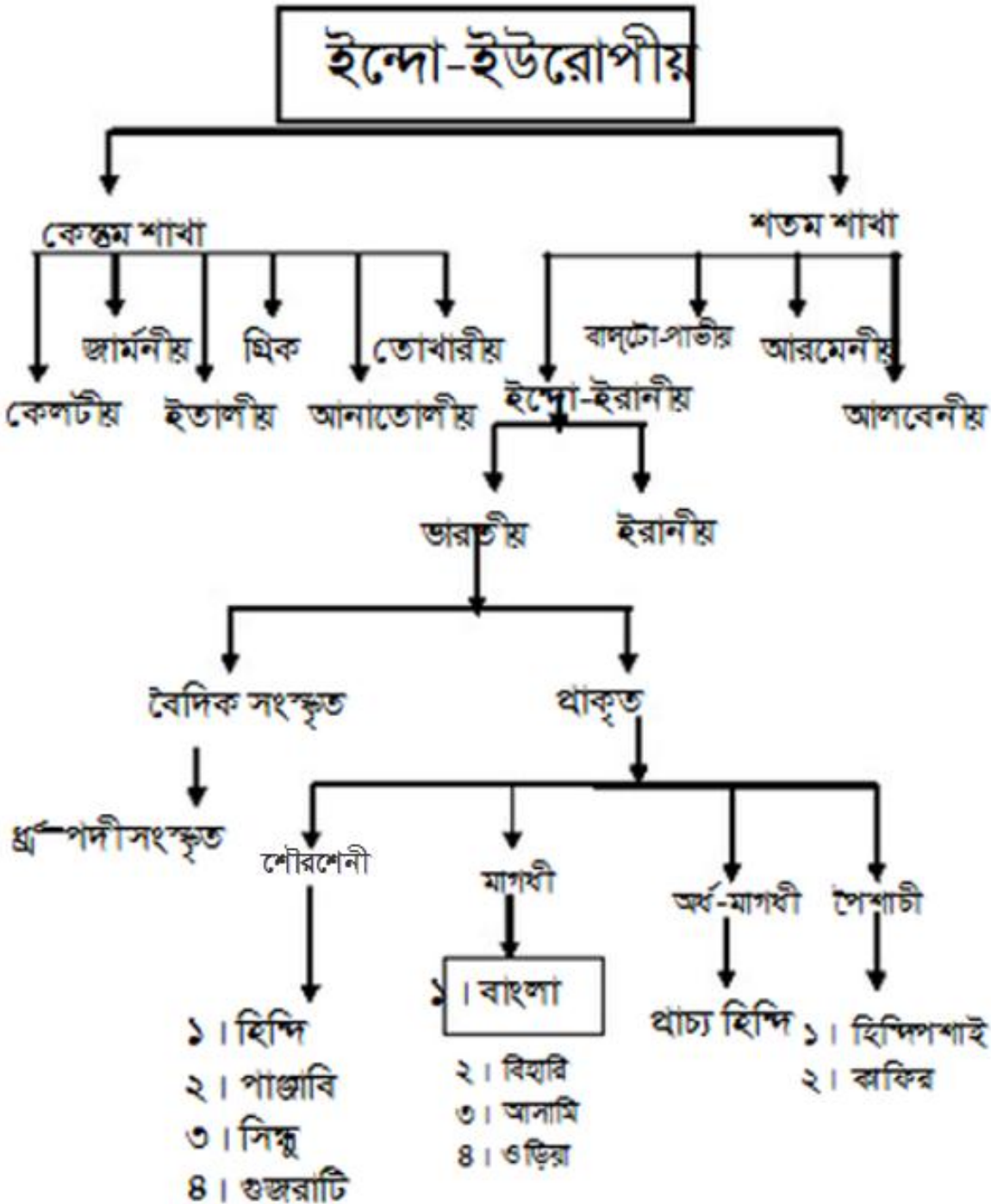
মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের সময় লেগেছে ১০০ বছর; সে সময়টিকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণ (১৭৬০-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ)

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

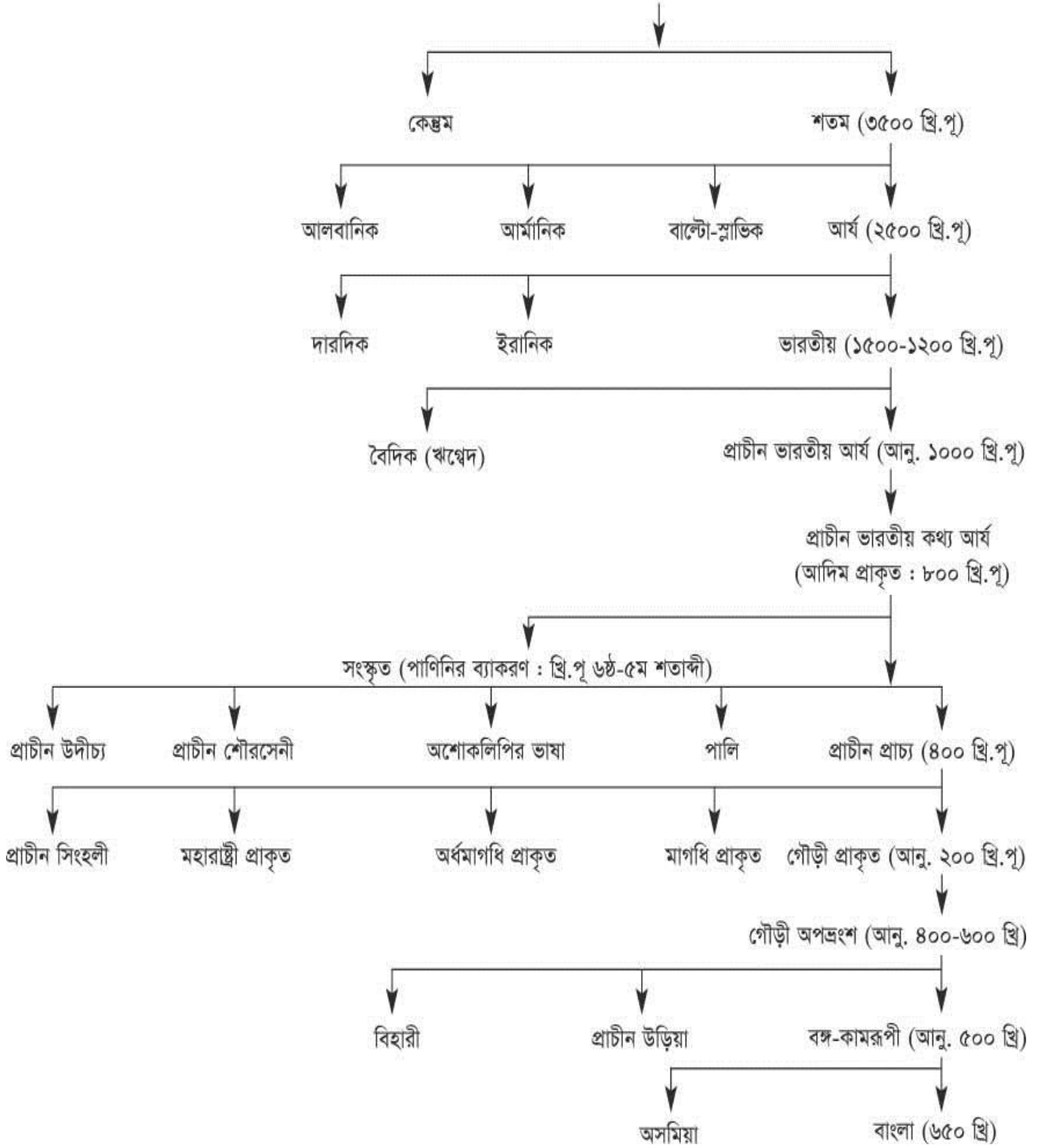
- ⇒ বাংলা কোন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? - ইন্দো ইউরোপীয়।
- ⇒ বাংলা ভাষার জন্ম → খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে।
- ⇒ ড. মুহম্মদ শহীদুল-এর মতে বাংলা ভাষার জন্ম → গৌড়ীয় প্রাকৃত- অপভ্রংশ হতে।
- ⇒ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা ভাষার জন্ম → মাগধীপ্রাকৃত- অপভ্রংশ হতে।

- ⇒ অপভ্রংশ-বিশেষ ভাষা বিচ্যুত বা বিকৃত ভাব
- ⇒ ভাষা শ্রেণীবিভাগের প্রধান পদ্ধতি → বংশগত শ্রেণীকরণ পদ্ধতি।
- ⇒ বাংলা লিপি → ব্রাহ্মী লিপি।
- ⇒ তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে প্রিয় ভাষাবংশ- ইন্দো-ইউরোপীয়।

নিচে চিত্রের সাহায্যে বাংলা ভাষার উৎপত্তি দেখানো হলো:



ইন্দো-ইউরোপীয়



বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী:

- ⇒ ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষা এসেছে → গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে।
- ⇒ ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয় → সপ্তম শতাব্দীতে।
- ⇒ কত সালে চর্যাপদ প্র ম প্রকাশিত হয় → ১৯১৬ সালে।
- ⇒ প্র ম প্রকাশের সময় চর্যাপদের নাম ছিল → হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা।
- ⇒ চর্যাপদে সবচেয়ে বেশী পদ রচনা করেছেন → কাহ্ন পা।
- ⇒ চর্যাপদের প্র ম পদটির রচয়িতা → লুইপা।
- ⇒ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে চর্যার ভাষা ছিল → আলো অাঁধারি ভাষা।
- ⇒ চর্যাপদে তত্ত্বকথা বিধৃত হয়েছে → বৌদ্ধ ধর্মের।
- ⇒ চর্যার পদগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে → নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে।
- ⇒ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয় → বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রাম থেকে।
- ⇒ মৈথিলি ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে → ব্রজবুলি ভাষা তৈরী।
- ⇒ পুঁথি সাহিত্যের প্র ম সার্থক কবি → ফকির গরীবুল্লাহ।
- ⇒ বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেন → মৈথিলা ভাষায়।
- ⇒ বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন → বিদ্যাপতি।
- ⇒ বড়ু চন্ডীদাসের প্রকৃত নাম → অনন্ত।
- ⇒ বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা → চন্ডীদাস।
- ⇒ মুসলমান কবিদের মধ্যে বৈষ্ণব পদ রচনা করেন → শেখ ফয়জুল্লাহ।
- ⇒ বিজয়গুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেন → বরিশাল জেলায়।
- ⇒ গোরক্ষ বিজয় রচনা করেন → শেখ ফয়জুল্লাহ।
- ⇒ “মস্তকের সাধন কিংবা শরীর পাতন” এই উক্তিটি → ভারত চন্দ্র রায়গুণাকরের।
- ⇒ ‘মধুর চেয়েও আছে মধু সে আমার দেশের মাটি’ উক্তিটি → সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
- ⇒ “মোদের গরব, মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা” → অতুল প্রসাদ সেন।
- ⇒ “যে সবে বঙ্গোতে জন্মি হিংসে বঙ্গবানী সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি” → আব্দুল হাকিম।
- ⇒ “স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়” উক্তিটি → রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ⇒ “নানা দেশে নানা ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?” → রামনিধি গুপ্ত।
- ⇒ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন → চর্যাপদ।
- ⇒ চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন → মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯০৭)
- ⇒ চর্যাপদের রচয়িতার সংখ্যা → ২৪ জন (মতান্তরে ২৩জন)
- ⇒ চর্যাপদের পুঁথি সংরক্ষিত ছিল → নেপালের পুঁথি শালায়।
- ⇒ ভাষার দিকে থেকে বাংলা ভাষার দ্বিতীয় গ্রন্থ → শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- ⇒ আদি চন্ডীদাস ছিলেন → বড়ু চন্ডীদাস।
- ⇒ বাংলা ভাষায় প্র ম রামায়ণ রচনা করেন → কৃত্তিবাস ওঝা।
- ⇒ যুগ বিভাগ অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে ভাগ করা যায় → তিন ভাগে। (মতান্তরে অন্ধকার যুগসহ ৪ ভাগে)
- ⇒ ‘ব্রজবুলি’ ভাষায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন → ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

- ⇒ মহাভারতের প্রধান রচয়িতা → কাশীরাম দাস।
- ⇒ ‘শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’- উক্তিটির প্রবক্তা → চন্ডীদাস।
- ⇒ ‘হারামণি’ সংগ্রহ করেন → মনসুর উদ্দিন।
- ⇒ ‘কড়চা’ কী? → শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনী গ্রন্থ।
- ⇒ ‘লাইলী মজনু’ রচনা করেন → দৌলত উজির বাহরাম খাঁ।
- ⇒ ‘হাতেম তাই’ কাব্যের রচয়িতা → সৈয়দ হামজা।
- ⇒ ‘জঙ্গনামা’ কাব্যের রচয়িতা → ফকির গরীবুল্লাহ।
- ⇒ বাংলা সাহিত্য সম্রাট বলা হয় → বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।
- ⇒ বাংলা গদ্যের পথিকৃৎ → উইলিয়াম কেরি।
- ⇒ সর্ব প্র ম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন → ম্যানোয়েল দ্য আক্সুস্পসাঁও।
- ⇒ প্র ম বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণের নাম → (ODBL)
- ⇒ সর্ব প্র ম প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার নাম → দিকদর্শন (১৮১৮)এপ্রিলে প্রকাশিত
- ⇒ ‘শাহানামা’- এর-লেখক → কবি ফেরদৌসী।
- ⇒ ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে’ লাইনটি পাওয়া যায় → ভারতচন্দ্র রায় এর ‘অন্নবদামঙ্গল’ কাব্যে।
- ⇒ বাংলা সনের প্রবর্তক → সম্রাট আকবর।
- ⇒ পৃথিবীর আদিভাষার নাম → ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা।
- ⇒ বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ → ১২০১ খ্রি:-১৩৫০খ্রি।
- ⇒ বাংলা সাহিত্যের যুগ সন্ধিক্ষণের কাল → ১৭৬০ খ্রি:-১৮৬০খ্রি:
- ⇒ মধ্যযুগের প্র ম নিদর্শন → শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (লেখক বড় চন্ডীদাস)।
- ⇒ মধ্যযুগের শেষ কবি → ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২খ্রি:- ১৭৬০খ্রি:)
- ⇒ যুগ সন্ধিক্ষণের কবি → ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২খ্রি:- ১৮৫৯খ্রি:)
- ⇒ বাংলা প্র ম নাটক ভদ্রার্জুন → তারাচরণ শিকদার।
- ⇒ বাংলা প্র ম মৌলিক নাটক → কুলীনকুলসর্বস্ব (রাম নারায়ণ তর্করত্ন)
- ⇒ বাংলা উপন্যাসের সার্থক জন্মদাতা → বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ⇒ বাংলা গদ্যের জনক → ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- ⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলমান কবি → শাহ মুহম্মদ সগীর। (১৪০০ খ্রি:- ১৫০০ খ্রি:)
- ⇒ বাংলা লিপির উৎস → ব্রাহ্মী লিপি।
- ⇒ লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি → ছড়া।
- ⇒ মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি → মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
- ⇒ বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে → মাগধী প্রকৃত অথবা গৌড়ীয় প্রাকৃত অপভ্রংশ থেকে।
- ⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ → কাব্য।
- ⇒ প্রাচীন কালে বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের সবচেয়ে বেশি চর্চা হয় → পাল ও সেন রাজাদের আমলে।

বাংলা ভাষার রূপঃ-

বাংলা ভাষার দু'টি রূপ। যথা- লৈখিক ও মৌখিক। এদেরও দু'টি রূপভেদ রয়েছে। বাংলা ভাষার এ প্রকারভেদ বা রীতিভেদ এভাবে দেখানো যায় ু

• সাধু ও চলিত ভাষার গঠনগত পার্থক্য:

১। সাধু ভাষায় কিছু সর্বনামের রূপ পূর্ণাঙ্গ কিন্তু চলিত ভাষায় সেগুলো সংক্ষিপ্ত।

যেমন-

তদীয়-তার আপনকার-আপনার তোমায় - তোমাকে

ইহারা-এরা ইহা-এটা আমায়- আমাকে

উহাদিগকে-ওদের তোমা-তোমার তাহাদিগকে-তাদের।

২। সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ পূর্ণাঙ্গ ও সুনির্দিষ্ট। কিন্তু চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ সংক্ষিপ্ত। হইলে-হলে, লাগিলেন-লাগলেন, শুনিয়া-

শুনে, হইয়া-হয়ে।

কহিল-বলল, কহিলেন-বললেন, করিতে-করতে।

৩। সাধুরীতির কিছু অনুসর্গ চলিত রীতিতে সংক্ষিপ্ত ও ভিন্নতর রূপ নেয়।

যেমন- হইতে-হতে, অপেক্ষা-চেয়ে।

৪। সাধুভাষায় তৎসম ও সমাসবদ্ধ শব্দের প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু চলিত ভাষায় অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রাধান্য থাকে।

যেমন-

মৃগশাবক- হরিণশিশু প্রতिसংহরণপূর্বক-সংযত করে

পরিত্রাণ-রক্ষা সমভিব্যাহার-সঙ্গে

শরসন্ধান-তীরসংযোগ উলে-খশ্বনমাত্র-কথাশুনেই

দৃষ্টিপাত পূর্বক-দৃষ্টিপাত করে, সহকার তরুতলে-আমগাছের নিচে।

৫। কিছু কিছু বিশেষণ শব্দ ব্যবহারেও সাধু ও চলিতের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

যেমন-

অতি-খুব অতিমাত্র-অত্যন্ত ঈদৃশ-এই রকম

এরূপ-এরকম/এমন সাতিশয়-অত্যন্ত

মাদৃশ-আমার মতো

বহুতর-নানারকম যেসকল-যেসব তাদৃশ-তারমতো।

৬। সাধুভাষায় সন্ধি বা সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার বেশি। কিন্তু চলিত ভাষায় সন্ধিবদ্ধ ও সমাসবদ্ধ শব্দ ভেঙ্গে লেখা হয়।

যেমন: বনমধ্যে - বনের মধ্যে, ভাৰাপৰ্ণ - ভাৱেৰ অৰ্পণ, আলবাল জলসেচনে - আলবালে জলসেচনে।

ভাষাৱীতিৰ ৰূপান্তৰ :

⇒ সাধুৱীতি থেকে চলিত ৱীতিতে পৰিবৰ্তনেৰ কতকগুলো সাধাৰণ সূত্ৰ -

(১) ক্ৰিয়াপদেৰ মধ্যস্থিত 'ই' স্বৰধ্বনি লোপ পায়।

যেমন- খাইব > খাব।

(২) ক্ৰিয়াপদেৰ মধ্যে যদি 'উ' স্বৰধ্বনি থাকে, তাহলে চলিত ৱীতিতে তা লোপ পায়।

যেমন - যাউক > যাক।

(৩) পদেৰ শেষে 'অ', 'আ', 'ও' থাকলে পূৰ্ববৰ্তী 'ই' স্বৰধ্বনি 'এ'-তে ৰূপান্তৰিত হয়।

যেমন - বিকাল > বিকেল।

(৪) পদেৰ শেষে 'অ', 'আ', 'এ' থাকলে পূৰ্ববৰ্তী 'উ' স্বৰধ্বনি 'ও'-তে ৰূপান্তৰিত হয়।

যেমন - উঠে > ওঠে।

(৫) পূৰ্ববৰ্তী 'ই' স্বৰধ্বনিৰ প্ৰভাৱে চলিত ৱীতিতে 'আ' ধ্বনি 'এ' -তে ৰূপান্তৰিত হয়।

যেমন - দিয়া > দিয়ে।

(৬) পদেৰ পূৰ্বে উ/উ থাকলে চলিত ৱীতিতে শেষেৰ 'আ' পৰিবৰ্তিত হয়ে 'ও' হয়।

যেমন - জুতা > জুতো।

বাংলা ব্যাকৰণেৰ আলোচ্য বিষয়:

সব ভাষাৰই ব্যাকৰণে প্ৰধানত নিমডুব লিখিত চাৰটি বিষয়েৰ আলোচনা কৰা হয়।

(১) ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

(২) শব্দতত্ত্ব বা ৰূপতত্ত্ব (Morphology)

(৩) বাকতত্ত্ব বা পদক্ৰম (Syntax)

(৪) অৰ্থতত্ত্ব (Semantics)

(৫) এছাড়া অভিধানতত্ত্ব (Lexicography), ছন্দ ও অলঙ্কাৰ প্ৰভৃতিও

ব্যাকৰণেৰ আলোচ্য বিষয়।

বাংলা ব্যাকৰণও এৰ আলোচ্যবিষয়

(ক) ধ্বনি-তত্ত্ব: এই অংশে ধ্বনি, ধ্বনিৰ উচ্চাৰণ, ধ্বনিৰ বিন্যাস, ধ্বনিৰ পৰিবৰ্তন, বৰ্ণ, সন্ধি, ষ-ত্ব বিধান, ণ-ত্ব বিধান প্ৰভৃতি ধ্বনি-সম্বন্ধীয় ব্যাকৰণেৰ বিষয়গুলি আলোচিত হয়।

(খ) শব্দ বা ৰূপতত্ত্ব: শব্দেৰ প্ৰকাৰ, পদেৰ পৰিচয়, শব্দ গঠন, উপসৰ্গ, প্ৰকৰণ, ক্ৰিয়াৰ কাল, ক্ৰিয়াৰ ভাব, শব্দেৰ ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়েৰ আলোচনা ৰূপতত্ত্ব থাকে।

(গ) ব্যাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম: বাক্য, বাক্যের অংশ, বাক্যের, প্রকার, বাক্য বিশ্লেষণ, বাক্য পরিবর্তন, পদক্রম, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, বাক্য সংগোজক, বাক্য বিয়োজন, যতিচ্ছেদ বা বিরামচিহ্ন প্রভৃতি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

(ঘ) অর্থতত্ত্ব: শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ। যেমন- মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থক শব্দ ইত্যাদি অর্থতত্ত্বের আলোচনা বিষয়ে।

(ঙ) ছন্দ-প্রকরণ: এই বিভাগে ছন্দের প্রকার ও নিয়মসমূহ আলোচিত হয়।

(চ) অলংকার প্রকরণ: এই বিভাগে অলংকারের সংজ্ঞা ও প্রকার ইত্যাদি আলোচনা করা হয়।

ব্যাকরণ সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

১. বাংলা ভাষা ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় → ১৭৪৩ সালে।
২. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন → ম্যানোয়েল দ্য-আস সুম্পসাঁও।
৩. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রথম যে ভাষায় রচিত হয় → পর্তুগিজ ভাষায়।
৪. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় → পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে।
৫. রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা ব্যাকরণের নাম → গৌড়ীয় ব্যাকরণ।
৬. The Origin and Development of the Bengali Language' (ODBL) গ্রন্থের রচয়িতা → ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।
৭. 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থের রচয়িতা → সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বাংলা ব্যাকরণ → বাংলা ভাষা পরিচয়।
৯. 'বাংলা শব্দ তত্ত্ব' গ্রন্থের রচয়িতা → রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০. প্রাচীনকালের ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী → পাণিনি।
১১. পাণিনি রচিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের নাম-অষ্টাধ্যায়ী।
১২. পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করে-সংস্কৃত ভাষায়।
১৩. ব্যাকরণ প্রধানত চার প্রকার।

২৪. হসন্ত চিহ্ন: স্বরবর্ণ যুক্ত না হলে ব্যঞ্জন বর্ণের নিচে একটি বিশেষ চিহ্ন দেওয়া হয়। ঐ চিহ্নের নাম হসন্ত চিহ্ন। যথা- ক্, দ্, বাক্ ।
২৫. ৭(খন্ড-ত) হচ্ছে ত-এর খন্ড রূপ।
২৬. ক-ম পর্যন্ত ত ২৫টি বর্ণকে বর্গীয় বর্ণ বলা হয়।
২৭. ক-ম পর্যন্ত ত ২৫টি ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনি বলা হয়।

বাংলা স্বরধ্বনি গুলোর ৭টি অবস্থান:

ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ

ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি:

১) ব্যঞ্জন বর্ণ প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত, যথা-

- (ক) স্পর্শ বর্ণ: উচ্চারণ স্থানে অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সাথে জিববার কোনো না কোনো অংশের সম্পূর্ণ স্পর্শ বা যোগ হয় বলে এগুলো স্পর্শ বর্ণ। যথা- ক থেকে ম পর্যন্ত ত ২৫টি।
- যাথাঃ ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম।
- (খ) অন্তঃস্থ বর্ণ: স্পর্শ বর্ণ ও উষ্ম বর্ণের মধ্যে অবস্থিত বলে এদেরকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়। যথা- য, র, ল, ব।
- (গ) উষ্মবর্ণ: উচ্চারণ উষ্মা অর্থাৎ বায়ু প্রধান ভাবে থাকে বলে এগুলোকে উষ্মবর্ণ বলে। যথা-শ, ষ, স, হ। ২) উচ্চারণ স্থান অনুসারে স্পর্শ বর্ণের পাঁচটি বিভাগ আছে। সেগুলোকে বর্ণ বলে। যেমন-ক-বর্ণ, চ-বর্ণ, ট-বর্ণ, ত-বর্ণ ও প-বর্ণ।
- ৩) অঘোষ বর্ণ: যে সব বর্ণের উচ্চারণ কালে স্থান ও করণের আঘাতজনিত ঘোষ বা শব্দ শ্রুত হয় না, সেগুলোকে অঘোষ বর্ণ বা শ্বাস বর্ণ বলা হয়। যথা- ক খ চ ছ ট ঠ ত থ প ফ শ ষ স।
- ৪) ঘোষ বর্ণ: যে সব বর্ণের উচ্চারণকালে স্থান ও করণের আঘাতজনিত ঘোষ বা শব্দ শ্রুতে পাওয়া যায় বলে এগুলোকে ঘোষ বর্ণ বলা হয়। যথা-প্রতি বর্ণের শেষ তিনটি বর্ণ এবং হ।
- ৫) স্পৃষ্ট বর্ণ: ক-বর্ণ, ট-বর্ণ এবং প-বর্ণের প্র ম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণগুলোর উচ্চারণকালে, মুখ-বিবরের বিশেষ স্থান স্পৃষ্ট হয় বলে এগুলো স্পৃষ্ট বর্ণ।
- ৬) ঘৃষ্ট বর্ণ: চ, ছ, জ, ঝ এদের উচ্চারণকালে জিহবা ও তালুর স্পর্শের পরেই উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণজাত ধ্বনি বের হয় বলে এগুলোকে ঘৃষ্ট বর্ণ বলে।
- ৭) প্রতি বর্ণের প্র ম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণকালে এদের সাথে প্রাণ বা শ্বাস বায়ু অল্প নির্গত হয় বলে এগুলোকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলে।
- ৮) বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং উষ্ম বর্ণের উচ্চারণকালে এদের সাথে প্রাণ বা শ্বাস বায়ু অধিক নির্গত হয় বলে এগুলোকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে।
- ৯) ‘য’, ‘র’, ‘ল’, ‘ব’ এদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যবর্তী। এরা খাঁটি ব্যঞ্জনবর্ণ নয় এবং খাঁটি স্বরবর্ণও নয়। এজন্য য ও ব কে অর্ধস্বর এবং র ও ল কে তরলস্বর বা অর্ধব্যঞ্জন বলে।
- ১০) ‘র’ জিহবার অগ্রভাগ কম্পিত করে এ বর্ণ উচ্চারণ হয় বলে একে কম্পনজাত বর্ণ বলে।
- ১১) ‘ল’ এর উচ্চারণকালে জিহবার দু পাশ দিয়ে বায়ু বের হয় বলে একে পার্শ্বিক বর্ণ বলে।
- ১২) শ, ষ, স তিনটি শুদ্ধ উষ্ম বর্ণ উচ্চারণকালে শিশ দেওয়ার মত শব্দ হয় বলে এগুলোকে শিশবর্ণ বলা হয়।

- ১৩) ‘ড়’, ‘ঢ়’ জিহবার নিম্নভাগ দিয়ে দন্তমূলে তাড়না করে এদের উচ্চারণ করতে হয় বলে এদেরকে তাড়নজাত বর্ণ বা তাড়িত ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।
- ১৪) অনুস্বার ও বিসর্গকে অযোগবাহ বর্ণ বলে।
- ১৫) চন্দ্রবিন্দু (ঁ) চিহ্ন বা প্রতীকটি পরবর্তী স্বরবর্ণের অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে। এজন্য এটিকে অনুনাসিক বলে।